বৈষ্ণব ধারায় ভাবান্তরজনিত রূপান্তরকামিতা

শ্রাবণী চট্টোপাধ্যায়

চর্চাটা অনেক আগেই ছিল। আগে বলতে আমি দু'পাঁচশো বছর পিছিয়ে যাবার কথা বলছি না। ভারতীয় মহাকাব্য বা পুরাণ একটু একটু পড়া বা জানার আগ্রহ নিয়েই যা জানা যায় তাতেই প্রমাণিত এই তৃতীয় প্রকৃতি-চিন্তন মোটেই পশ্চিমী দুনিয়ার প্রচার আলোকধন্য নতুন বিষয় নয়। ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন ও অধ্যাত্ম চেতনা বহুকাল থেকেই বিষয়টি নিয়ে ভেবেছে ও ভাবছে। মহাভারতের পৃষ্ঠায় চোখ পাতলে দেখি এই মহাকাব্যের বিশাল চত্বরে যাঁর জায়গা অন্যান্যদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা বা অন্যরকম। তিনি কৃষ্ণ সখা, গান্ডীবধন্য, দ্রৌপদী বিজেতা, মহাবাহু, সব্যসাচী অর্জুন। বস্তুত এই বিশাল মহাকাব্য যাঁর দিকেই বার বার প্রচার ও প্রসারের আলো ফেলেছে সেই মহাবীর অর্জুনকে আমরা তিনটি পৃথক লিঙ্গ পরিস্থিতিতে দেখি,—পুরুষ, (অর্জুনের পুরুষ সত্তা নিয়ে আলোচনা এই নিবন্ধে নিস্প্রয়োজন) নারী, অর্ধনারীশ্বর। মহাভারতের বিরাট পর্বে (রচনা কাল ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আমরা দেখতে পাই অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজার রাজধানীতে

অর্জুনের প্রবেশ একাল ও সেকালে অত্যন্ত পরিচিত এক তৃতীয় প্রকৃতি বৃহন্নলা রূপে। যাঁর পুরুষালি অঙ্গসৌষ্ঠবে নারীর বেশভূষা ও আচরণ। বৃহন্নলা মেয়েদের মতো ব্লাউজ বা কাঁচুলি পরতেন। পরতেন লাল রঙের সিল্কের কাপড়। হার, চুড়ি, কানে কুণ্ডল, পায়ে নূপুর, চোখে কাজল, লম্বা বেণী, গুরু নিতম্বিনী বৃহন্নলা বিরাট রাজকন্যার সংগীত ও নৃত্য শিক্ষিকার কাজ পেলেন। পদ্মপুরাণে অর্জুনের স্ত্রী সত্তার নাম আর্জুনি। এই রূপান্তরের কারণ—অভিন্ন হৃদয় বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের রতি বিলাসকে জানার আকাঙ্ক্ষা। বন্ধুর মনোবাঞ্ছা জেনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সাথে পরমসুখে রতি ক্রীড়ায় মেতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনিন্দ্য দেহকান্তি ও পরম সুখদায়ক রতিবিলাসে মুগ্ধ আর্জুনি বাহ্যজ্ঞান হরিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই মহাকাব্যের আর এক রূপান্তরকামী চরিত্র শিখণ্ডী।

মহাকাব্যের যুগে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগত দিকগুলো নিয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণ আজকের মতো অমেধ্য ছিল না। লিঙ্গাশ্রয়ী স্বভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে হঠাৎ অসুবিধায় পড়া গেল যখন নারীদেহে পুরুষ কিংবা পুরুষ দেহে নারীসত্তা সম্পন্নদের বিশেষ একটি সংস্কৃত শব্দবন্ধে চিহ্নিত করা হল। সন্ধা (শব্দটি পুরুষ দেহে নারী প্রবৃত্তি ধারীদের জন্য প্রযোজ্য) ও খাঁটি ব্যাকরণীয় লিঙ্গান্তর সূত্র অবলম্বনে সন্ধি (নারী দেহে পুরুষ প্রবৃত্তিধারী) প্রয়োগ করে। এঁরা পুরুষ বা নারী সমকামী নয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে পুরুষ থেকে নারীত্বে পরিবর্তনকামীরা কেউ কেউ রূপান্তরের জন্য লিঙ্গচ্ছেদ করাতেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি এই পরিবর্ত পরিস্থিতিকে কখনোই উৎসাহিত করেনি। সেক্ষেত্রে কৌপীন ধারণের ব্যবস্থাই ছিল গ্রহণীয় যা আজও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের ভেকধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত। পুরুষত্বকামী নারীরা শক্ত কাপড়ের বাঁধনে স্তনযুগল বেঁধে রাখতেন। আজকের দিনে ওই ধরনের মানুষরা Hormone therapy বা transsexual operation ইত্যাদির সাহায্য নিচ্ছেন। লিঙ্গচ্ছেদ বা Castration উত্তর ভারতীয় হিজড়াদের মধ্যে বহুল প্রচলিত এবং এই প্রথাটি মুসলিম শাসনের সময়কাল থেকেই হারেম পাহারাদার খোজাদের জন্য অপরিহার্য ছিল। দক্ষিণ ভারতে এ ধরনের পরিবর্তিত লিঙ্গ পরিস্থিতির মানুষদের জোগাপ্পা বলা হয়।

পশ্চিমী দুনিয়ার মিডিয়া বিভাগের চূড়ান্ত ক্যাম্পেনের কারণে রূপান্তরকামী বা transgender শব্দটি আমাদের এই তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতবর্ষের রান্নাঘর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। বেশির ভাগ 'সুস্থ' (?) বা বলা ভালো মূল স্রোতের জনসমাজ এই তৃতীয় বিকল্পদের কখনও ঘৃণা কখনও বিদ্রূপ কখনও বা 'আহারে' গোছের শব্দে কিংবা চূড়ান্ত ব্যঙ্গ-এ ক্ষত বিক্ষত করছে। বক্তব্য এই — প্রাচ্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মকর্মকে একটু নেড়ে ঘেঁটে দেখলে দেখা যাবে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে এই তৃতীয় বিকল্প সসম্মানে জায়গা করে নিয়েছে বহুকাল আগে থেকেই। শুধু তাই নয় আস্ত একটা তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। একেবারে হাতের কাছে থাকা মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারাটির অন্দর মহলের দরজায় কান

রাধারমন চরণদাস বাবাজী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখায় সখী সাধন বা সখী ভেকি অতি গূঢ় এক সাধন প্রণালী। এঁরা প্রধানত নিজেদের রাধা দাসী মনে করেন। বৈষ্ণব দর্শনে কেনই বা এ ধারার স্থান আর কীই বা সেই ভজন কৌশল? বৈষ্ণবীয় রাগানুগা ভজন সম্পূর্ণ আনুগত্যের সাধনা। ভগবান নিজের থেকে তাঁর ভক্তকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। সুতরাং তাঁর লীলা পুষ্টির জন্য লীলা সঙ্গিনীদের উচ্চ স্থান।

পাতলে শোনা যাবে ভাবান্তর ও রূপান্তরের অনির্বচনীয় একাত্মীকরণের গুন গুন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্ব দর্শনকে সামান্য বিশ্লেষণ এবং এ ধারার প্রবক্তা স্বয়ং শ্রী চৈতন্যদেব, তাঁর একেবারে অন্তরঙ্গ পার্ষদ, চৈতন্য পরবর্তী দু একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজনদের জীবন প্রেক্ষা নিয়ে ভাবান্তর ও রূপান্তরকামিতা বিষয়টির সর্বকালীন অধ্যাত্ম চর্চার প্রাসঙ্গিকতা ও আজকের চৈতন্য চিন্তনের অনুসারী ও অনুগামীদের একেবারে হাতের কাছে থাকা উদাহরণ সাজিয়ে তোলাই আমার এই লেখার উদ্দেশ্য। যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভাবান্তরজনিত রূপান্তরের যে অতি গূঢ় ও অপরিহার্য উপস্থিতি তা অনেকেই মানতে নারাজ। তবু একটু খোলা মনে সজাগ চোখের বিশ্লেষণের নিরিখে দেখা যায় বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণবীয় জীবন চর্চায় আজও এর প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মীয় চিন্তা ধারায় পূজিত হন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার যুগল প্রণয়ী রূপ। এখন প্রশ্ন হল কে বা কারা এই আরাধ্য যুগল? ভারতীয় ধর্মীয় ও পৌরাণিক সাহিত্যে এঁদের আবির্ভাব বা আগমন-ই বা কীভাবে? এ প্রসঙ্গে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা প্রয়োজন। না হলে যৌক্তিক প্রমাণের অভাব থেকেই যাবে। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো ভগবদ্ভক্তের কাছে রাধা কৃষ্ণ হচ্ছেন প্রেমের বিনিময় কিন্তু সাধারণ প্রেম নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহত্তম দান হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমিক রূপে লাভ করার অনুপম শিক্ষা।

ভগবদ্ তত্ত্বকে একটু সরিয়ে রেখে ঐতিহাসিক পটভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ পূজন বা তাঁকে

জানার আগে বেদে আমরা বিষ্ণু নামটি পাই যিনি অগ্নির রূপ, সূর্যের অভেদ, তাঁর বাহন গরুড়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণু বর্ণনার পরেই আসে নারায়ণ শব্দটি। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকে যিনি ঋষি অঙ্গিরার শিষ্য একজন ঋষি, পিতা বসুদেব, মাতা দেবকী। এরপরই কালানুক্রমিক ভাবে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে পাই যিনি ঐশ্বর্যধারী, মহাকূটনৈতিক অবশ্য অনুসরণীয় একজন ব্যক্তিত্ব। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এসে বিষ্ণু নারায়ণ কৃষ্ণ একাকার হয়ে যান। এরই সাথে চলে আসা লোককথায় আর একজন কৃষ্ণের অস্তিত্ব। যিনি আভীর বা গো-পালক সম্প্রদায়ের নায়ক। যাঁর বাবা বসুদেব, মা কংসরাজার বোন দেবকী, পালক পিতা গোকুলাধিপতি নন্দরাজ ও পালিকা মাতা যশোমতী বা যশোধরা সংক্ষেপে যশোদা। বর্তমান শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্তি পূজিত হয় সেই ঘনশ্যাম বা কালোবরণ মূর্তি দক্ষিণ ভারতীয় আলবার সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রথম পূজিত হন। পরবর্তীকালে এই সবকটি কৃষ্ণ নামক ব্যক্তিত্ব একটি কৃষ্ণে আরোপিত হয়।

বাল্য ও কৈশোরে তাঁকে নিয়ে আভীর গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত লোককথা, মহাভারতের কাহিনি এবং ক্রমান্বয়ে শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবৎ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সুদৃঢ় ভিত্তিই হল বৈষ্ণব সমাজের প্রাণ কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব দর্শনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারানী। আগুনের যেমন দাহিকাশক্তি, ফুলের যেমন সুবাস — তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা। তাই শক্তি ছাড়া শক্তিমানের অস্তিত্ব বৈষ্ণব দর্শনে স্বীকৃত নয়। এই শক্তি ও শক্তিমানের যুগল প্রণয়ী রূপই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর দিব্য জীবনচর্চায় সাধারণকে জানিয়ে গেলেন—জনার্দন ভাবগ্রাহী, অর্থাৎ ঈশ্বর অনুভবের বা তাঁকে উপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধযুক্ত ভালোবাসা। বৈষ্ণব দর্শনে পঞ্চভাব পঞ্চরসাশ্রিত—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচটি পর্যায়ের মধ্যে শেষেরটি সর্বোৎকৃষ্ট। অর্থাৎ কান্তাভাবের ভজন। এই শেষের স্তরটিতে পুরুষোত্তমই প্রিয়তম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান দান হল ভগবানকে প্রেমিক রূপে লাভ করার অনুপম শিক্ষা। ভগভক্তির এ অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত স্তর মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কোন আচার্য্য-ই ভারতবাসীকে দিতে পারেন নি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্দ ও দশম স্কন্দ ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস ও লীলা চরিতার্থতার জন্য তাঁর হলাদিনী শক্তি প্রকাশ ও বিকাশের উল্লেখ রয়েছে।

এতো গেল একেবারে গোড়ার উৎস সন্ধান। এবার আসা যাক মূল পর্বে। লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রেমাস্পদা শ্রীরাধিকাকে নিয়ে প্রচলিত যে লীলা কাহিনিগুলি বহু বছর ধরে লোক মুখে প্রচলিত সেই কাহিনিগুলির-ই বিশেষ একটি অংশ আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। কাহিনিটি হল—

শ্রীরাধিকার প্রেমকে অনুভব করার ইচ্ছা হয়েছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। কোন একদিন

বড় আন্তরিক মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়ার কাছে প্রস্তাব রাখেন—"আমি তোমার প্রেমকে অনুভব করতে চাই। আমার প্রতি এই অনাবিল প্রেমকে তুমি কেমন করে আস্বাদন কর এবং তার মাধুর্য্য-ই বা কী তা জানতে চাই। এই প্রেমৈষণা তোমাকে কী সুখ দেয় তা বুঝতে চাই।" শ্রীরাধিকা কৌতুকছলে বলে ফেলেন— "আমার প্রেমকে বুঝতে হলে 'আমি' হতে হবে।" শ্রীকৃষ্ণের সেই আমি অর্থাৎ শ্রীরাধিকা হওয়ার বাসনা হল। শ্রী স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ করলেন সেই বিখ্যাত শ্লোকটি—

শ্রী রাধায়ঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কী দৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাসা মদনুভবতঃ কী দৃশং বেতি লোভাওদ্ভাবাঢ্য
সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।
—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ

[শ্রীরাধায়ঃ—শ্রীমতী রাধারানীর; প্রণয় মহিমা—প্রেমের মাহাত্ম্য; কীদৃশো— কি রকম; বা —অথবা; অনয়া—তাঁর দ্বারাই; এব—কেবল; আস্বাদ্য—আস্বাদনীয়; যেন—সেই প্রেমের দ্বারা; অদ্ভুত-মধুরিমা—অত্যাশ্চর্য মাধুর্য; কী দৃশঃ—কি রকম; বা অথবা; মদীয়ঃ—আমার; সৌখ্যম—সুখ; চ—এবং; অস্যাঃ—শ্রীরাধার; মৎঅনুভবতঃ—আমার মাধুর্য্যের অনুভব বশতঃ; কী দৃশম—কি রকম; বা — অথবা; ইতি—এভাবেই; লোভাৎ—লোভবশতঃ; তৎ—তাঁর (রাধারানীর); ভাব-আঢ্যঃ—ভাবযুক্ত হয়ে; সমজনি—আবির্ভূত হয়েছেন; শচী-গর্ভ-সিন্ধৌ—শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে; হরি—শ্রীকৃষ্ণ; ইন্দু—চন্দ্র।

শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কী রকম, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার সে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কী রকম এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন সেই সুখই বা কী রকম এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন]

আবার ঠিক একই ভাবে লোককাহিনি বলছে শ্রীরাধিকার সুবল হওয়ার বাসনা হয়েছিল। প্রেমিকের সাথে দেখা করার জন্য শ্রীমতীকে কতই না ছল চাতুরী করতে হয়। কত নিন্দা-অপবাদ-কলঙ্ক, কিন্তু কৃষ্ণ সখা সুবল সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের পাশে কাছে গায়ে গা লাগিয়ে থাকে। সুবল আর কৃষ্ণ একই সাথে মাঠে যায়, ঘাটে যায়, বাড়ি ও বাথানে যায়। কারুর তাতে কোনও দৃকপাত নেই, নেই কোনও বক্তব্য। সারাক্ষণ কৃষ্ণ সঙ্গ পাবার বাসনায় শ্রীরাধিকা সুবলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছেন। এমন একদিন বহুক্ষণ প্রিয়তমের

সাক্ষাৎ না পেয়ে শ্রীরাধিকা সুবলের পোশাক পাগড়ি ধার করে পরলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লোক গাথা বলছে শ্রীমতী রাধারানী ও সুবল একই রকম দেখতে ছিলেন কারণ সুবল শ্রীরাধিকার ভাই। পোশাকে সুবল সাজলেও নিজের স্তন দুটি আড়াল করতে বাছুরী কোলে তুলে নিয়ে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন। সেদিন সুবলের ছদ্মবেশ এত নিখুঁত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ সুবল বেশধারী রাধারানীকে বহুক্ষণ ভাই সুবল রে, তোকে দেখে আমার চম্পক বরণীর মুখপদ্মটি মনে পড়ছে রে ইত্যাদি বলে রাধা বিরহে বিলাপ করেছেন।

উপরিউক্ত দুটি লোক কাহিনি বা বলা ভালো গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার ভক্তিরসের জোগানদার যে লীলা কাহিনির দুটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত হয়েছে তার প্রথমটি শ্রী চৈতন্য দেবের ওপর এবং দ্বিতীয়টি চৈতন্য পরিকর গদাধর প্রভুর ওপর আরোপিত। মানে তাঁরা কিন্তু নিজস্ব ভাব সাধনার জগতেই বিরাজ করতেন। প্রাথমিক ভাবে ভাববাদী দর্শনকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক নিপীড়নের সাধারণ মানুষকে ধর্মের আশ্রয়ে মুক্তি দানের (যা কিনা সেই সময়ে একমাত্র বিকল্প) আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সেই চেষ্টা পর্যবসিত হল ভাব সাধনার এক চরম পর্যায়ে। নবদ্বীপের নৈয়ায়িক নিমাই পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক যুগ নায়ক শ্রীচৈতন্যদেব উন্নীত হলেন দেহোত্তীর্ণ ভাবসাধনার সর্বোচ্চ শিখরে। অবলম্বন হিসাবে বেছে নিলেন প্রেম সাধনাকে। পরম পুরুষের সাথে মিলনের একমাত্র অবলম্বন প্রেম সাধন। সে প্রেমেরও আবার বিচার আছে। সে প্রেম দুই প্রকার। স্বকীয়া ও পরকীয়া। চৈতন্যদেব পরকীয়া প্রেম সাধনার সাধক। কারণ নিঃস্বার্থ, উন্নত অধ্যাত্ম চেতনামণ্ডিত পরকীয়া প্রেমের দ্বারা উপলব্ধ হন ঈশ্বর। সেই ভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবৎকালের অন্তপর্বে সাধনায় নারীত্ব যাকে বৈষ্ণবীয় দর্শনে রাধাভাব বলা হয়ে থাকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তারই প্রমাণ মেলে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের ৮নং শ্লোকে—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু
মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।

—শ্রী শিক্ষাষ্টক

[আশ্লিষ্য—প্রেম ভরে গাঢ় আলিঙ্গন; বা — অথবা; পাদরতাং—চরণসেবা পরায়ণ; পিনষ্টু—আত্মসাৎ করুক; মাম্—আমাকে; অদর্শনাৎ—দেখা না দিয়ে; মর্মহতাম—মর্মাহত; করোতু—করুক; বা — অথবা; যথা—যেমন; তথা—তেমন; বা—অথবা; বিদধাতু—সে করুক; লম্পট—যে পরস্ত্রী সঙ্গ করে; মৎপ্রাণনাথ—আমার প্রাণনাথ; তু—কিন্তু; সঃ—সে; এব—কেবল; ন অপরঃ—অন্য কেউ নয়।

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্বক পেষণ করুক বা দেখা না দিয়ে মর্মাহতই করুক, সে লম্পট পুরুষ আমার প্রতি যেমনই আচরণ করুক না কেন সে অন্য কেউ নয় আমার-ই প্রাণনাথ]

চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন—

আমি কৃষ্ণ পদ দাসী তেঁহো রস সুখ রাশি
আলিঙ্গিয়া কর আত্মসাৎ।
কি বা না দেন দরশন জারেন মোর তনুমন
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ।।

এই প্রাণনাথ শব্দটা খুব তাৎপর্যবাহী। প্রাণনাথ বলতে বোঝায় নারীর স্বামী অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ অথবা প্রিয়তম বা প্রেমিককে। পরকীয়া-য় প্রেমিকের স্থান উচ্চে, রাধা ভাবে ভাবিত শ্রী চৈতন্যদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর প্রাণনাথ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর এই দিব্যশ্রী ভাব সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ ছাড়া আমাদের জানার একমাত্র অবলম্বন শ্রীশিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোক। হতভাগ্য বাঙালি অনেক আগেই মহাপ্রভুর যাবতীয় চিন্তন-দর্শন ও ভাব ভাবনার লিখিত দলিল হারিয়েছিল। এই মহাভাবাবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেব কেমন থাকতেন, কী ভাবে থাকতেন, কী ভাবেই বা সেই ভাব স্ফূর্তি ঘটত তার প্রকৃত তথ্য বা তত্ত্ব বাঙালির কাছে চির অধরা মাধুরী। কেবলমাত্র চৈতন্য পরিকর শ্রীস্বরূপ দামোদর ও মুরারীগুপ্তের কড়চা থেকে কিছুটা জানা গেলেও যে বর্ণনা আমরা বিভিন্ন আকর গ্রন্থে পাই তা কতখানি ভক্তবৃন্দের দ্বারা আরোপিত ও কতখানি চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের বৈষ্ণব মহাজনদের স্ব-ভাবনার ফসল সে প্রসঙ্গ অন্য। তবে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় সন্ন্যাস গ্রহণের আগের যে নিমাই পণ্ডিতকে আমরা জানতে পারি বা সন্ন্যাস-পরবর্তী পুরীতে অবস্থানকালীন ২৪ বছরের ১২ বছর যে Logical ভাববাদী দার্শনিক মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে জানা যায়— জীবনের শেষ ১২টি বছর তাঁর এই ভাবান্তর জনিত রূপান্তর এবং এ সম্পর্কে তাঁর রচিত শিক্ষাষ্টকের ৮নং শ্লোক-এ যে প্রমাণ তিনি রেখে গেলেন— "**বিদ্‌ধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্ত স এবঃ নাপরঃ** তাতে তিনি যে স্পষ্টতই কৃষ্ণগত প্রাণা শ্রীমতীর অর্থাৎ ভাবিনির ভাব ধারণ করেছিলেন এ বিষয়ে নিশ্চিত।

এর পর আসি অন্যতম চৈতন্য পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রসঙ্গে। বৈষ্ণব মহাজন গণ বলছেন শ্রী গদাধর গৌরের হলাদিনী শক্তি। শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক শ্রী গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনের মহা সম্মানীয় নেতা। পাণ্ডিত্যে তিনি

অবিসংবাদী। চিরকুমার গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে তাঁর প্রাণপুরুষ ভাবতেন। তাই সু-রসিক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে গৌরাঙ্গদেবের আর এক নাম 'গদাধর-প্রাণনাথ'। গদাধর ছিলেন শক্তিমানের উপাসক। অর্থাৎ পুরুষোত্তমের সেবক ভাব সাধনার এক চরম উন্নত পর্যায়ে শ্রী মহাপ্রভুর একই দেহে রাধাকৃষ্ণ যুগল ভাব প্রকট হত। এ প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রী স্বরূপদামোদর গোস্বামী তাঁর কড়চাতে লিখলেন—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতির্হলাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবাপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যাং প্রকট মধুনা তদদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম।।
—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ

[রাধা—শ্রীমতী রাধারানী; কৃষ্ণ —শ্রীকৃষ্ণের; প্রণয়—প্রণয়ের; বিকৃতি—বিকার; হলাদিনী শক্তি —শ্রীমতী রাধিকা; অস্মাৎ—এই হেতু; এক-আত্মনৌ—স্বরূপত একাত্মা বা অভিন্ন; অপি—হওয়া সত্বেও; ভুবিপুরা—অনাদি কাল থেকে; দেহ ভেদ্‌ম—ভিন্ন দেহ; গতৌ—ধারণ করেছেন; তৌ—রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে; চৈতন্য-আখ্যাম্‌—শ্রীচৈতন্য নামে; প্রকটম—প্রকট হয়েছেন; অধুনা—এখন; তৎ-দ্বয়ম—সেই দুই দেহ; চ-এবং ঐক্যম—একত্রে; আপ্তম্‌—যুক্ত হয়ে; রাধা—শ্রীরাধিকার; ভাব—ভাব; দ্যুতি—কান্তি; সুবলিতম্‌—বিভূষিত; নৌমি—আমি প্রণতি নিবেদন করি; কৃষ্ণ স্বরূপম—যিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ তাঁকে।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার স্বরূপা। সুতরাং শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি। এই জন্য শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারানীর এই ভাব ও কান্তি যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।]

উপরিউক্ত শ্লোক ও তার ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় শ্রীচৈতন্যদেব একই দেহে শক্তি ও শক্তিমান অর্থাৎ রাধা গোবিন্দের মিলিত বিগ্রহ ছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে গদাধর পণ্ডিত তাঁকে প্রিয়তম ভাবতেন।

মহাপ্রভু ও গদাধর পণ্ডিতের ভালোবাসা ও ভাব-সাধনার জগত বাংলা ছেড়ে আশ্রয় নিল উড়িষ্যায় পুরীতে। অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীতে চলে গেলেন, প্রিয়তম বিরহে কাতর গদাধর প্রভুও কিছুদিনের মধ্যেই পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কাশীমিশ্রের রাধাকান্ত মঠ বা গম্ভীরাতে মহাপ্রভু আর যমেশ্বর টোটা বা

টোটা গোপীনাথে গদাধর পণ্ডিত। একে অপরের প্রতি ছিলেন মুগ্ধ প্রণয়াসক্ত ও পারমার্থিক বন্ধনে বন্দি। ইতিহাস বলছে মহাপ্রভূর রহস্যজনক অন্তর্ধানের মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই গদাধর পণ্ডিত প্রিয়তম বিরহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এর পর আসি চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাস ঠাকুর শ্রীখণ্ডে। শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট— এখানে গৌরাঙ্গ দেবের রসরাজ বিগ্রহ। সরকার ঠাকুর গৌর নাগরী ভাবের প্রবক্তা এবং তাঁর ভজনানন্দী শিষ্য শ্রীলোচনদাস ঠাকুর এই ভাবসাধনায় অনুশীলিত। এই ভাবসাধনায় গৌরাঙ্গদেব প্রেমিক বা পুরুষোত্তম আর ভক্তরা সকলেই নাগরী বা প্রেমিকা। লোচনদাস ঠাকুর এই গৌর নাগরী ভাবে সারাক্ষণ মগ্ন থাকতেন।

সখী ভেকি সাধন প্রণালী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাখায় সখী সাধন বা সখী ভেকি অতি গূঢ় এক সাধন প্রণালী। এঁরা প্রধানত নিজেদের রাধা দাসী মনে করেন। বৈষ্ণব দর্শনে কেনই বা এ ধারার স্থান আর কীই বা সেই ভজন কৌশল? বৈষ্ণবীয় রাগানুগা ভজন সম্পূর্ণ আনুগত্যের সাধনা। ভগবান নিজের থেকে তাঁর ভক্তকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। সুতরাং তাঁর লীলা পুষ্টির জন্য লীলা সঙ্গিনীদের উচ্চ স্থান। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দ লীলামৃতে উল্লেখ রয়েছে—

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোহপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রস পুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখী নাং রসজ্ঞ।
—গোবিন্দ লীলামৃত (১০/১৭ শ্লোক)

[বিভু—সর্বশক্তিমান; অপি—যদিও; সুখ-রূপঃ—সচ্চিদানন্দময়; স্ব-প্রকাশঃ — স্বয়ং প্রকাশ রূপ; অপি—যদিও; ভাবঃ—চিদ্বিলাস; ক্ষণম—অপি—ক্ষণিকের জন্য; ন—কখনও না; হি—অবশ্যই; রাধাকৃষ্ণয়ো—রাধাকৃষ্ণ; যাঃ—যাকে; ঋতে—ব্যতীত; স্বাঃ—তাঁর কায়ব্যূহ স্বরূপিনী সখীর; প্রবহতি—পরিচালিত করা; রস-পুষ্টিং—সর্বোচ্চ রসের পূর্ণতা; চিৎ বিভূতী—চিন্ময় ঐশ্বর্য; ইব-মত ঈশঃ—পরমেশ্বর ভগবান; শ্রয়তি—আশ্রয় গ্রহণ করেন; ন—না; পদম্—পদঃ; আসম্—তাদের; কঃ—কে; সখীনাম—সখীদের; রসজ্ঞ— কৃষ্ণ ভক্তিরস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

রাধাকৃষ্ণ স্বপ্রকাশ, আনন্দময় এবং অনন্ত হলেও সখীগণ ছাড়া ক্ষণিকের জন্য তাঁদের লীলামৃত সর্বোচ্চ রসের পূর্ণতা পায় না। যেমন পরমেশ্বর ভগবান এর চিদ্বিভূতি ছাড়া

ঈশ্বরত্ব পুষ্টি লাভ করে না। তেমনি কোন রসজ্ঞ সখীর পদাশ্রয় গ্রহণ না করলে রাধাকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য অনুমান বা অনুভব করা এবং লীলা স্মরণ করা যায় না]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে সখী দাস্য সম্পর্কে বলেন—

রাধা কৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর।।
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার।।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি।।
রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।।
—চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ, সাধ্যসাধনতত্ত্ব।
২০১-২০৫ নং পয়ার, রায় রামানন্দ-মহাপ্রভু সংবাদ,

অতি দুষ্প্রাপ্য রসিক সাধক ভাবানন্দী মহাত্মা কান্তা ভাব গ্রহণ করে ঈশ্বর সাধন করার জন্য সখীর অনুগতা হয়ে তাঁর দাসীর ভাব বেশ বর্ণ অলংকার পরে একজন কিশোরীর মতো আদর্শ প্রেমিকার জীবন যাপন করেন। এই প্রণালীতে পুরুষেরা সখী ভাব ধারণ করে নিজেদের রাধা দাসী বলে পরিচয় দেন। শাড়ি ঘাঘড়া ওড়না ইত্যাদি পরেন। লম্বা চুল রাখেন। নারী বেশে সজ্জিত হয়ে ঈশ্বর সেবা করেন। শ্রীরামপুরে এমন একজন সাধককে জানি যিনি সখী ভেক নেওয়ার পর সকল সাজ সজ্জা গ্রহণের সাথে সাথে গলার স্বর মেয়েদের মতো নকল করতে করতে নিজস্ব স্বর হারিয়েছিলেন। শ্রী বিগ্রহের সামনে আরতি করার সময় নায়িকার সজ্জা ও ভাব গ্রহণ করেন যা সাধারণ মহিলাদের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় জিজ্ঞাসা করেছি — "আপনি কতদিন এই সাধন চর্চায় রয়েছেন?" তাঁর অনেক কথা থেকে সারকথা যা উঠে এল তা হল, জন্ম জন্মান্তর থেকেই তিনি সখীর দাসী। বুঝলাম, হয় তিনি পূর্বাশ্রমের কথা বলতে চান না অথবা নিজের মানসিক রূপান্তর এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যে খুব বেশি অতীতের কথা আর মনে নেই। সুতরাং প্রকৃত তথ্য আর কোনও দিনই জানা যাবে না।

সখী ভেকি সাধন ধরার সর্বজনশ্রদ্ধেয়া সাধিকা নবদ্বীপের সমাজবাড়ির শ্রীমতী ললিতা

দাসী। বরিশাল জেলার গৌর নদী থানার অন্তর্গত হরিসেন গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে বাংলার ১২৮০ সালে ২৭ শে আষাঢ় গুরু পূর্ণিমা তিথিতে শ্রী কালীকান্ত ভট্টাচার্য ও গৌরসুন্দরী দেবীর একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। নাম—গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তিনি ১৩০৫ মতান্তরে ১৩০৭/৮ সালে নবদ্বীপের শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাবাজী চরণদাস মহারাজের এক অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রী চৈতন্যদাস গোপীভাবের সাধনা করতেন। গোপালকৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকেই দাসী ভাবে সাধনার সন্ধান পান। গোপালকৃষ্ণকে তাঁর গুরুদেব আদর করে জয়গোপাল বলে ডাকতেন। সমস্ত আশ্রমের সেবার ভার ছিল জয়গোপালের উপর। প্রতিদিন ঠাকুর সেবা, ভোগরাগ, শ্রীগুরুদেব সহ আশ্রমবাসী সকলের আহার নিদ্রা, অতিথি আপ্যায়ন সব কিছুই জয় গোপাল নারী সুলভ দক্ষতায় আনন্দের সঙ্গে করতেন। অবসর সময়ে তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে শাস্ত্র ও বৈষ্ণব দর্শন আলোচনায় মেতে থাকতেন। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে দেখা দিল গোপী ভাব। অথবা বলা ভালো তিনি যে অন্যান্য গুরুভাইদের থেকে মানসিক গঠনে অন্যরকম তা তিনি বুঝতে পারছিলেন। ইষ্টগোষ্ঠী চলাকালীন শরৎ মহারাজ কৃষ্ণ আবেশে, রাধা বিনোদ গোস্বামী রাধা আবেশ ও জয়গোপাল ললিতা আবেশে পাঠ ও কীর্তনে বিভোর থাকতেন। একদিন এক ভক্ত মন্দিরে একটা শাড়ি নিয়ে আসলেন। জয়গোপালের গুরুদেব নিজে শাড়িটা বিগ্রহের প্রসাদী করে তাঁর অন্য এক শিষ্যকে জয়গোপালকে পরিয়ে আনতে নির্দেশ দেন। সেই দিন শ্রী বিগ্রহের প্রসাদী শাড়ি মালা ইত্যাদিতে জয় গোপাল সখী বেশ ধারণ করেন। তাঁর গুরুদত্ত ভেক নামা হল— ললিতা দাসী। ভেক ধারণের পর যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন অতি নিষ্ঠায় আশ্রমের সকলের সেবা করে গেছেন। আশ্রমবাসী ছাড়াও বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, অতিথি, অভ্যাগত সকলেই তাঁর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ ছিলেন। বস্তুত তাঁর আমলেই নবদ্বীপের সমাজ বাড়ি সমগ্র ভারতবর্ষে বৈষ্ণব পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ললিতা সখী ভেক নামার পর আজীবন কুলবধূর মতো আশ্রমে থেকেছেন। বহু দূরদূরান্ত থেকে তাঁকে দেখার জন্য ভক্তরা সমাজ বাড়িতে যেতেন। তিনি ঘোমটায় মুখ ঢেকে সকলকে পরিবেশন করতেন এবং আশ্রমের চৌহদ্দির বাইরে কখনও খুব একটা বেরোতেন না। ললিতা সখীর এই বেশ ধারণের বিরুদ্ধে তৎকালীন সমাজ ও তথাকথিত বৈষ্ণব কুলশীলদের শত সহস্র তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ, ব্যঙ্গোক্তি, কটুকথা, সামাজিক নিপীড়ন তিনি অকাতরে সয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের লিখিত মতামত (শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী ২য় খন্ড ৩৮৫ পৃষ্ঠা) সমস্ত রকম সেবাকাজে ইনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর রচিত রাধারমণ চরিতসুধা, শ্রী সুরত কথামৃত, শ্রী সঙ্গীত মাধব টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহকারী অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য দলিল। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ৫ অগ্রহায়ণ সখী মা দেহ রাখেন। কিন্তু আজও নবদ্বীপের সমাজবাড়ি বা ললিতা সখী কুঞ্জ উৎসুক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে এক বিশেষ বৈষ্ণবতীর্থ।

শ্রী ললিতা সখী প্রবর্তিত গোপী ভাবের ভজন আজও সমাজবাড়িতে চলছে। সেখানে আজও প্রতি সন্ধ্যায় ভাবাশ্রয়ী বৈষ্ণব সখী সাজে সজ্জিত হয়ে শ্রী বিগ্রহের আরতি করেন।

বস্তুত বৈষ্ণব ধারার বিভিন্ন সাধন প্রণালীতে রাগানুগা ভজন এক বিশিষ্ট স্থানের দাবিদার। এই পথ অনুসারীরা সাধনার এক বিশেষ স্তরে চর্চার মাধ্যমে বা মননের দ্বারাই কান্তা ভাবের সাধনা করে থাকেন, এখানেও সেই অনুভাবের-ই প্রসঙ্গ স্বকীয়ার ঐহিক স্বার্থ চেতনায় নয়, পরকীয়ার অধ্যাত্ম কেন্দ্রিক উন্নত উজ্জ্বল নিঃস্বার্থ প্রেম অঙ্গীকার করেই পাওয়া যেতে পারে অরূপের সন্ধান। তাঁকে (পরমেশ্বর) জানার ও উপলব্ধির এই অমোঘ টানেই আজও ছুটে চলেছেন বহু ভাবানন্দী, ভজনানন্দী রসিক সাধক তাঁর রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত দেহ ও মন নিয়ে।

সহায়তা সূত্র :

১। শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত। টীকা ভাষ্য, শ্রীরাধা গোবিন্দ নাথ ও শ্রী অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত।
২। শ্রী শ্রী গোবিন্দ লীলামৃত
৩। মহাভারত (বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব) কালীপ্রসন্ন সিংহ
৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
৫। শতপথ ব্রাহ্মণ
৬। ছান্দোগ্য উপনিষদ
৭। তৈত্তীরিয় উপনিষদ
৮। পদ্ম পুরাণ
৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী (২য় খণ্ড)
১০। তৃতীয় প্রকৃতি — অমর দাস উইলহেম
১১। শ্রী শিক্ষাষ্টক
১২। Chakra (Editorial, 01/03/2003)